بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ এপ্রিল, ২০২৩ মোতাবেক ১৪ শাহাদাত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হচ্ছে সেই কলেমা যা তওহীদ বা একত্ববাদের ভিত্তি। মহানবী (সা.) বলেছেন, **নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির জন্য আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করেছে**। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাঁর কৃপাদৃষ্টি যাচনা করে, তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়ে, নিজের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করে মানুষ যখন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়ে তখন সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়। আর যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছেন, **আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন**। একস্থানে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দেবেন। আর এই শিক্ষাই সকল নবীরা নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) একবার বলেছেন, আমি এবং আমার পূর্বের নবীরা সর্বোত্তম যে কলেমা বা বাক্যটি পড়েছেন তা হলো, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ।

অতএব এটি হলো সকল নবীর শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেসব নবীর জাতির লোকেরাই, যাদের জন্য এই শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, এটিকে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে ভুলে গিয়ে শির্ক-এর মাধ্যম বানিয়ে বসেছে। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে গিয়েছে। আমরা সৌভাগ্যবান, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে সেই কামেল বা উৎকর্ষ শিক্ষা দিয়েছেন যা শির্ক-এর মূলোৎপাটন করেছে এবং তিনি (সা.) তওহীদের সত্যিকার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের ইহ ও পরকালকে সুন্দর করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

অতএব এখন যে (ব্যক্তি) মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করবে এবং বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি প্রদান করবে সে-ই খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারীও হবে আর মহানবী (সা.)-এর শাফাআত বা সুপারিশ থেকেও অংশ লাভ করবে। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, কেয়ামত দিবসে আমার শাফাআত লাভের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবে সে, যে বিশুদ্ধচিত্তে কিংবা পবিত্র অন্তঃকরণে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র স্বীকারোক্তি প্রদান করবে। অতএব মহানবী (সা.)-এর শাফাআত বা সুপারিশ লাভের জন্য বিশুদ্ধচিত্তে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে, যাতে জগতের কোনো মিশ্রণ থাকবে না, সে-ই তাঁর শাফাআত লাভের অংশীদার হবে। মহানবী (সা.) হলেন সেই সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ নবী যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা শাফাআত বা সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মোতাবেক তাঁর (সা.) প্রতি ঈমান আনয়নও আবশ্যক এবং তাঁর (সা.) এই পদমর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) এভাবে বলেছেন যে, এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে বিশুদ্ধচিত্তে

مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ ও لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র সাক্ষ্য দিবে অথচ আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুনকে হারাম করবেন না। একস্থানে শুধুমাত্র لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ রয়েছে, অন্যত্র مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ-ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতএব এখন তওহীদের স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার শেষ ও পূর্ণাঙ্গ নবী হওয়ার স্বীকারোক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনিই (সেই রসূল) যিনি নিজের উম্মতের মাঝ থেকে সম্পূর্ণরূপে শির্ক-এর মূলোৎপাটনের ঘোষণা দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) সেই ব্যক্তির প্রতি চরম অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন, যে কোনোভাবে সামান্যতম শির্ক-এরও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের মাঝেও এমন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে যারা এমন সুপ্ত শির্ক-এ লিপ্ত যা করতে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) কঠোরভাবে বারণ করেছেন। আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে মান্য করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। যিনি ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ প্রাঞ্জলভাবে, সেগুলোর গভীরতা ও অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার সাথে আমাদের অবহিত করেছেন। যেভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে {তিনি (আ.)} আমাদেরকে বলেছেন সেখানে مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ (সা.)-এর মাকাম বা পদমর্যাদার বিষয়েও আমাদের অবহিত করেছেন। এখন আমি এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যা এই বিষয়টিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে এবং আমাদেরও এদিকে মনোযোগী করে যে, আমাদেরও এই বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে কীভাবে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বাণী اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ-এর ব্যাখ্যা নিজেই করে দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি লক্ষণ থাকা একান্ত আবশ্যক। {তিনি (আ.) সেখানে লক্ষণাবলী বর্ণনা করছিলেন,} যার মধ্যে প্রথমটি ছিল, أَصْلُهَا ثَابِتٌ অর্থাৎ যার শেকড় সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। দ্বিতীয় লক্ষণ হলো, فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ অর্থাৎ যার ডালপালা বা শাখা-প্রশাখা গগনচুম্বি। তৃতীয় লক্ষণ হলো, تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ অর্থাৎ সর্বদা টাটকা ফল প্রদান করে। অতএব ইসলামই সেই ধর্ম, যা এই মানদণ্ডে পরীক্ষিত। যাহোক, প্রথম লক্ষণ أَصْلُهَا ثَابِتٌ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি সমূহ, যা প্রথম লক্ষণ, যা দ্বারা কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বুঝানো হচ্ছে। (অর্থাৎ أَصْلُهَا ثَابِتٌ-কে যদি প্রমাণ করতে হয় তাহলে এর প্রথম লক্ষণ হলো, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে এটিকে এতো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমি যদি (এর) সকল দলীল-প্রমাণ লিখতে বসি তাহলে কয়েক খণ্ডেও তা শেষ হবে না। (বই-পুস্তক লিখতে হবে।) তবে, উদাহরণস্বরূপ এর মধ্য হতে সামান্য কিছু নিম্নে লিখছি। যেমনটি এক স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারায় (আল্লাহ্) বলেছেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ১৬৫)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রাত ও দিনের পালাবদলে, আর সেসব নৌযানের চলাচলে যা সমুদ্রে মানুষের উপকারার্থে চলাচল করে, আর আল্লাহ্ আকাশ হতে যেই বারিধারা বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জিবিত করেন এবং পৃথিবীতে সকল প্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহে পরিবর্তন করেন এবং মেঘমালাকে আকাশ ও পৃথিবীতে নিযুক্ত করেছেন– এসবকিছু খোদা তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর এলহাম আর তাঁর সুপরিকল্পনার অধীনে কর্ম সম্পাদনকারী হওয়ার পরিচায়ক। তিনি (আ.) বলেন, এখন লক্ষ্য করো! এই আয়াতে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ঈমানের এই নীতি সম্পর্কে কীভাবে নিজের (সৃষ্ট) এই প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-কে প্রমাণ করেছেন আর প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে এই দলীল দিয়েছেন। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান নিজের সেসব সৃষ্টির মাধ্যমে, যেগুলো দেখলে এই আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, নিঃসন্দেহে এই জগতের একজন আদি, পরিপূর্ণ, এক-অদ্বিতীয় এবং সুপরিকল্পনার অধীনে কর্ম সম্পাদনকারী আর নিজ রসূলদের পৃথিবীতে প্রেরণকারী স্রষ্টা রয়েছেন। এর কারণ হলো, খোদা তা'লার এই সৃষ্টিকূল এবং বিশ্বজগতের এই পুরো ব্যবস্থাপনা, যা আমাদের চোখের সামনে রয়েছে এটি পরিষ্কারভাবে জানান দিচ্ছে যে, এই বিশ্বজগৎ আপনা-আপনি (সৃষ্টি) হয়নি, বরং এর একজন স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন যার মাঝে এসব গুণ থাকাও বাঞ্ছনীয় যে, তিনি রহমান তথা স্বতঃপ্রবৃত্ত দাতাও হবেন, রহীম তথা পরম করুণাময়ও হবেন, কাদেরে মুতলাক তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীও হবেন এবং এক-অদ্বিতীয় ও অংশিবাদি-মুক্ত হবেন আর আদি-অনন্ত হবেন অধিকন্তু সুপরিকল্পনার অধীনে কর্ম সম্পাদনকারীও হবেন আর সমস্ত পরিপূর্ণ তথা পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর সমাহার হবেন এবং ওহী অবতীর্ণকারীও হবেন।

অতএব, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হৃদয়ে শুধুমাত্র এক উপাস্য হবার ধারণাই সৃষ্টি করে না, বরং এ কথাও হৃদয়ে প্রোথিত করে এবং করা উচিৎ যে, আমাদের খোদা হলেন সেই এক খোদা যিনি আদি থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সব সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এই পুরো বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। আর সমস্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য আমাদেরকে তাঁর সমীপেই বিনত হতে হবে। অতএব, ঈমানের অবস্থা যখন এরূপ হয়ে যায় তখন তা পূর্ণ ঈমান হয়ে থাকে যাতে শিরকের মিশ্রণ থাকতেই পারে না এবং এটিই সেই ঈমান যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, বিশুদ্ধভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সাহায্য যাচনার ব্যাপারে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যার কাছে সাহায্য যাচনা করা যায় এমন সত্তা হওয়ার প্রকৃত অধিকার আল্লাহ্ তা'লারই রয়েছে। অর্থাৎ যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় অথবা সাহায্যকারী কেউ থাকলে কেবল আল্লাহ্ তা'লাই সেই যোগ্যতা রাখেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই সেই পরিপূর্ণ সত্তা যাঁর কাছে সাহায্য যাচিত হওয়া উচিত। অন্য কেউ এভাবে সেই যোগ্যতাই রাখে না আর না তার সেই সামর্থ্য আছে। আর এ বিষয়েই পবিত্র কুরআনও জোর দিয়েছে। অতএব বলা হয়েছে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ। প্রথমে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় গুণ رَبِّ, الرَّحْمٰنِ, الرَّحِيمِ এবং مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ প্রকাশ করেছেন, এরপর إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা ইবাদতও তোমারই করি এবং সাহায্যও তোমার কাছেই চাই। অর্থাৎ সেই ইবাদত

করার জন্য সাহায্যও তোমার কাছেই চাই। তোমার সাহায্য ছাড়া আমাদের ইবাদত করাও সম্ভব নয়। এতে বুঝা যায় যে, সাহায্য যাচনা করা যায় এমন সত্তা হওয়ার প্রকৃত অধিকার কেবল আল্লাহ্ তা'লারই রয়েছে। কোনো মানুষ, প্রাণী, পশুপাখি, মোটকথা কোনো সৃষ্টজীবের জন্য আকাশেও এবং পৃথিবীতেও এ যোগ্যতা নেই। কিন্তু হ্যাঁ, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিচ্ছায়ারূপে এ যোগ্যতা আল্লাহ্প্রেমী এবং খোদার মহাপুরুষদের দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাদের দোয়ার ফলেও সাহায্য লাভ হয়। তিনি বলেন, আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে, কোনো কথা আমরা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিব, বরং আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নির্দেশাবলীর অধীনে আমাদের থাকা উচিৎ। এরই নাম সীরাতে মুস্তাকীম এবং এ বিষয়টি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ এর মাধ্যমে সহজেই বুঝা সম্ভব। এর প্রথম অংশ থেকে বুঝা যায় যে, কেবল আল্লাহ্ তা'লাই মানুষের প্রেমাস্পদ, উপাস্য এবং অভিষ্ট লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় অংশ থেকে মুহাম্মদ (স.)-এর রসূল হবার সত্যতা প্রকাশ পায়।

এরপর তিনি বলেন, যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে তার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত খোদা তা'লার প্রাকৃতিক নিয়ম এটিই যে, তিনি সর্বদা তওহীদের তথা একত্ববাদের সমর্থন করেন। যত নবী তিনি প্রেরণ করেছেন, তারা এজন্য এসেছিলেন যেন তারা মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির উপাসনা দূর করে খোদার উপাসনা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাদের সেবা এটিই ছিল যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর বাণী যেন পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয় যেভাবে সেটি আকাশে জ্বলজ্বল করে। সুতরাং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলেন তিনি যিনি এ বাণীকে সর্বাধিক উজ্জ্বল করেছেন। যিনি প্রথমে মিথ্যা উপাস্যদের অসারতা প্রমাণ করেছেন, মিথ্যা উপাস্যদের দুর্বলতা প্রমাণ করেছেন এবং জ্ঞান ও শক্তির মানদণ্ডে তাদের হীনতা সাব্যস্ত করেছেন, আর যখন সবকিছু প্রমাণ করেছেন তখন চিরকালের জন্য সেই সুস্পষ্ট বিজয়ের নিদর্শন হিসেবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ-র বাণী রেখে গেছেন। তিনি কেবল প্রমাণবিহীন দাবিরূপে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলেননি, বরং তিনি প্রথমে প্রমাণ দিয়ে এবং মিথ্যা প্রভুদের অসারতা দেখিয়ে তারপর মানুষকে এদিকে মনযোগী করেছেন যে দেখো, এ খোদা ব্যতীত তোমাদের আর কোনো খোদা নেই যিনি তোমাদের ক্ষমতা ও শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছেন এবং সব দম্ভ ও অহংকার ধুলিসাৎ করেছেন। সুতরাং এই প্রমাণিত বিষয়কে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে চিরকালের জন্য এই কল্যাণময় কলেমা তিনি শিখিয়েছেন যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ।

মক্কা বিজয়ের সময় হাজার হাজার প্রতিমা পূজারী لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র শ্রেষ্ঠত্ব দেখেছে। মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন যে, এখনও কি তোমার কাছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয় নি? তখন সে উত্তর দেয় যে, আমি খুব ভালোভাবে বুঝে গেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য যদি থাকত তাহলে তারা আমাদের কিছুটা হলেও সাহায্য করত! যে তিনশত ষাটটি প্রতিমা আমরা বানিয়ে রেখেছি আর আমরা যাদের উপাসনা করি তারা কিছুটা হলেও আমাদের সাহায্য করত!

একজন বিরোধীর আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"পবিত্র ও সম্মানিত নবী (সা.)-এর শিক্ষা হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ পাঠ করলে পাপ দূর হয়– আপনার এই বক্তব্য একান্ত সঠিক। আর এটিই প্রকৃত সত্য। তোমরা

যে বলো পাপ মুছে যায় এটি একান্ত সঠিক কথা। যে শুধুমাত্র খোদাকেই এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করে এবং এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে সেই সর্বশক্তিমান ও এক খোদা প্রেরণ করেছেন, আর যদি এই কলেমায় (বিশ্বাসী হিসেবে) তার মৃত্যু হয় তাহলে সে নিঃসন্দেহে নাজাত বা মুক্তি লাভ করবে। আকাশের নীচে কারো আত্মহত্যায় কখনোই নাজাত লাভ হতে পারে না। কারো মৃত্যুতে নাজাত লাভ হয় না। আর কেউ যদি তোমার খাতিরে মারা যায় তাহলেও নাজাত লাভ হবে না। কলেমা দ্বারা নাজাত লাভ হবে। তিনি বলেন, আর তার চেয়ে বড় উন্মাদ আর কে হবে যে এই ধারণা করে যে, কলেমায় নাজাত লাভ করবে না, (একথা ভেবে দেখো এবং চিন্তা করো যে, এটা সাধারণভাবে বা এমনিতেই বলে দেয়া নয়,) কিন্তু খোদাকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করা আর এমন দয়ালু মনে করা যে, তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে পৃথিবীকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজ রসূল প্রেরণ করেছেন যার নাম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)– এটি এমন এক বিশ্বাস যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনের ফলে আত্মিক অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং আত্মপূজা দূরীভূত হয়ে তওহীদ সেই স্থান নিয়ে নেয়। পরিশেষে তওহীদের শক্তিশালী উচ্ছ্বাস হৃদয়কে পরিবেষ্টন করে ইহজগতেই জান্নাত প্রতীম জীবন আরম্ভ হয়ে যায়।

অতএব, বাস্তবতা জানতে হবে যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর প্রকৃত মর্মার্থ কী এবং مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ এর অর্থ কী? তাহলে জান্নাত ইহজগতেই আরম্ভ হয়ে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, যেমনটি তোমরা দেখো যে, আলো আসলে অন্ধকার থাকতে পারে না। একইভাবে যখন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর আলোকজ্জ্বল ছটা হৃদয়ে পড়ে তখন আত্মিক কলুষতার আবেগসমূহ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়, দূর হয়ে যায়। পাপের বাস্তবতা এটি ছাড়া আর কিছু নয় যে, বিদ্রোহের মিশ্রণে প্রবৃত্তির আবেগ-অনুভূতির কোলাহল হয়– যার অনুসরণের অবস্থায় একজন মানুষের নাম পাপী রাখা হয়। আর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর অর্থ, যা আরবী অভিধানের ব্যাপক ব্যবহারে জানা যায়, অর্থাৎ অভিধানে এর অর্থের যে বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তা হলো, **লা মাতলূবা লী, ওয়ালা মাহবূবা লী, ওয়ালা মা'বূদা লী, ওয়ালা মুতাআ লী, ইল্লাল্লাহ্** অর্থাৎ, আল্লাহ্ ভিন্ন আমার আর কোনো লক্ষ্য নেই এবং প্রেমাস্পদ নেই আর উপাস্য নেই এবং নেতা বা অনুসরণীয় নেই। যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন নিঃসন্দেহে ইহজীবনও জান্নাত হয়ে যায় এবং ক্ষমার উপকরণ এই পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়ে যায়।

এরপর কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন,

মূল কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'লা বহু আদেশ-নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর মাঝে কিছু এমন রয়েছে যেগুলো পালন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ হজ্জ। এটি তার জন্য ফরয বা আবশ্যক যার সামর্থ্য রয়েছে। প্রত্যেকের জন্য হজ্জ ফরয নয়। এছাড়া পথের নিরাপত্তা থাকতে হবে। হজ্জের জন্য এটিও আবশ্যক শর্ত। ব্যক্তির অবর্তমানে তার পরিবারের জীবন ধারণের যথেষ্ট ব্যবস্থাও থাকতে হবে। অর্থাৎ পরিবারের যেসব সদস্যকে রেখে যাচ্ছে তাদের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে, এমন নয় যে, তাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে হজ্জে চলে যাবে। অধিকন্তু এরূপ প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ হলে হজ্জ করা যাবে। অনুরূপভাবে যাকাতের বিষয়টি রয়েছে, যাকাতের জন্য নূন্যতম সম্পদ যার কাছে আছে সে-ই (যাকাত) দিতে পারে, অর্থাৎ যার ওপর যাকাত ফরয বা ওয়াজিব হয়। অনুরূপভাবে নামাযের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো সফরে বা অসুখবিসুখে নামায কসর হয়

বা জমাও হয়ে যায়, কিন্তু একটি বিষয় রয়েছে যার কোনো পরিবর্তন নেই আর তা হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ। এটিই আসল জিনিস এবং বাকি সবই এর পরিপূরক। ইবাদত না করলে তওহীদ পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ ইবাদত না করলে তওহীদ পূর্ণতা পায় না, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। বলার দায়িত্ব পালন হয় না। এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ বলে সে নিজ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সত্যবাদী তখন প্রমাণিত হয় যখন সে সত্যিকার অর্থেই ব্যবহারিকভাবে প্রমাণ করে দেখায় যে, বাস্তবিক অর্থেই (তার জন্য) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো প্রেমাস্পদ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যস্থল নেই।

অতএব এটিই হলো ঈমানের শর্ত। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি নয়। বরং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে থাকলে তা নিজের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন করে এবং তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে আর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও বান্দাদের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে, কেননা এগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আর নিজের প্রেমাস্পদের জন্য এবং যাকে পাওয়া উদ্দেশ্য তাঁর জন্য আর যার অন্বেষণ করা হয় তাঁর জন্য তাঁর আদেশ পালন করাও আবশ্যক। তখন একজন মানুষ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র ওপর সত্যিকার আমলকারী হয়, অর্থাৎ মান্যকারী হয়। তিনি (আ.) বলেন, যখন তার এই অবস্থা হবে এবং সত্যিকার অর্থেই তার ঈমান ও আমলের স্বরূপ এই স্বীকারোক্তির প্রতিফলন ঘটাবে তখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে এই স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদী নয়। অর্থাৎ এমনটি হলে খুবই ভালো কথা, তাহলে সে মিথ্যাবাদী নয়। (এর ফলে) সমস্ত জাগতিক উপকরণ পুড়ে গেছে এবং তার ঈমানের কারণে সেগুলোর ওপর এক বিলীনতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার মাধ্যমে সমস্ত জাগতিক উপকরণ পুড়ে গেছে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রেমাস্পদ হয়ে গেছেন। অতএব এরূপ ঈমানী অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরই সে মুখ দিয়ে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উচ্চারণ করে এবং এর দ্বিতীয় অংশে যে مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ রয়েছে তা রয়েছে দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেননা উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকল বিষয় সহজ হয়ে যায়। নবীগণ (আ.) দৃষ্টান্তের জন্য আসেন এবং মহানবী (সা.) ছিলেন সকল পরিপূর্ণ দৃষ্টান্তের সমষ্টি, কেননা সকল নবীর দৃষ্টান্ত তাঁর মাঝে একীভূত ছিল। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র প্রকৃত মর্ম মহানবী (সা.) উপলব্ধি করেছিলেন। মহান আল্লাহ্‌র যেসব নির্দেশ ছিল সেগুলোর ওপর সঠিকভাবে আমল এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সা.)। আর তিনি (সা.)-ই হলেন সেই পূর্ণাঙ্গীন দৃষ্টান্ত যিনি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র পূর্ণতা দিয়েছেন এবং এর ওপর আমলকে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

পুনরায় আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

প্রথাগত বয়আত কোনো উপকারে আসে না। এ ধরনের বায়আতের মাধ্যমে (সফলতার) অংশীদার হওয়া কঠিন। কোনো ব্যক্তি তখনই (সফলতার) অংশীদার হবে যখন সে নিজ সত্তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে খাঁটি প্রেম ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর সাথে যোগ দিবে। যার বয়আত করেছ তার সাথে পূর্ণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে সঙ্গী হয়ে যাও, বয়আত করা তখনই কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে। তিনি (আ.) বলেন, মুনাফেকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত বে-ঈমান সাব্যস্ত হয়েছে। তারাও প্রথাগত বয়আত করেছিল। তাদের মাঝে সত্যিকার ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়

নি, তাই মৌখিক لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তাদের কোনো কাজে আসেনি। তিনি (আ.) বলেন, অতএব এই সম্পর্ককে গভীর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এই সম্পর্ককে সে অর্থাৎ সত্যান্বেষী ঘনিষ্ট না করে এবং (এর জন্য) চেষ্টা না করে তাহলে তার অভিযোগ ও অনুশোচনা নিরর্থক। ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ককে বৃদ্ধি করা উচিত। যতদূর সম্ভব রীতিনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি, অর্থাৎ মুর্শিদের রঙে রঙিন হওয়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন, মানবাত্মা দীর্ঘ জীবনের আশ্বাস দেয়; [মানুষ ভাবতে থাকে যে, অনেক দীর্ঘ জীবন এখনও পড়ে আছে, আমি তো এখনও যুবক;] এটি এক প্রবঞ্চনা। জীবনের কোনো ভরসা নেই। ধার্মিকতা ও ইবাদতের প্রতি যথাশীঘ্র ঝোঁকা উচিত এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমি কী করছি, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র ওপর কতদূর আমল করছি? [এই উপদেশ তিনি (আ.) আমাদের প্রদান করেছেন।]

পুনরায় এক স্থানে তিনি (আ.) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমাকে বুঝা এবং এর দাবি পূরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন,

আমার কথার অর্থ কখনোই এটি নয় যে, মুসলমানরা অলস হয়ে যাক। কলেমা পড়া হয়ে গেল তো গা-ছাড়া হয়ে যাও! ইসলাম কাউকে অলস বানায় না। নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্য ও চাকরিবাকরিও করবে। কিন্তু আমি এটি পছন্দ করি না যে, খোদার জন্য তাদের কোনো সময়ই থাকবে না! [মুখে যদিও বলছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের বেলায় তাদের কোনো সময়ই নেই, জগৎ নিয়েই ব্যস্ত।] ব্যবসার সময়ে অবশ্যই ব্যবসা করো, এবং আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতিকে সেই সময়ও দৃষ্টিপটে রাখো যেন সেই ব্যবসাও ইবাদতের রঙ ধারণ করে। নামাযের সময় নামায পরিত্যাগ করবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয় যা-ই হোক না কেন, ধর্মকে অগ্রগণ্য করো। [ধর্মকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। আমরা নিজেদের অঙ্গীকারনামা পাঠের সময় এই অঙ্গীকারও করে থাকি যে, জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে ধর্মকে আমরা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেবো।] তিনি (আ.) বলেন, জগৎ যেন আসল লক্ষ্য না হয়, বরং ধর্ম যেন আসল লক্ষ্য থাকে। তাহলে জাগতিক কর্মকাণ্ডও ধার্মিকতায় পরিণত হবে। সাহাবীদের দেখো! তারা কঠিন থেকে কঠিনতর সময়েও খোদাকে পরিত্যাগ করেননি। যুদ্ধবিগ্রহের সময়গুলো এতটা ভয়ংকর হয়ে থাকে যে, সেটির কথা শুধু চিন্তা করলেই মানুষ ঘাবড়ে যায়। সেই সময়টি, যা উত্তেজনা ও ক্রোধের সময় হয়ে থাকে, সেরূপ পরিস্থিতিতেও তারা খোদার ব্যাপারে উদাসীন হন নি, নামায পরিত্যাগ করেন নি, দোয়ার সাথে কাজ করেছেন। এখন এটি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এমনিতে তো মানুষ সবরকম তোড়জোড় চালায়, বড় বড় বক্তৃতা করে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র কথা বলে, জলসার আয়োজন করে যেন মুসলমানদের উন্নতি হয়; কিন্তু খোদার বিষয়ে তারা এতটা উদাসীন থাকে যে, ভুলেও তাঁর দিকে মনোযোগ দেয় না। এমতাবস্থায় কীভাবে আশা করা সম্ভব যে, তাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে, যেখানে তারা সবাই জগৎ নিয়েই ব্যস্ত? [চেষ্টাপ্রচেষ্টা সব করছে জগতের জন্য আর নাম ব্যবহার করছে মুসলমানদের এবং আল্লাহ্‌র ধর্মের।] তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! যতক্ষণ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মস্তিষ্ক ও মননে প্রোথিত না হবে এবং নিজ সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ইসলামের আলো ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ উন্নতি হবে না। [উন্নতি করতে হলে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র মর্ম

অনুধাবন করতে হবে, আসল লক্ষ্য বানাতে হবে আল্লাহ্ তা'লাকে (লাভ করা), জগতকে নয়।]

এরপর কলেমা তাইয়্যেবার প্রকৃত মর্ম ও এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে এবং কীভাবে এটিকে উপলব্ধি করে আমাদের এর ওপর আমল করা উচিত তা (তুলে ধরতে গিয়ে) তিনি (আ.) বলেন,

আমি একাধিকবার বলেছি, তোমাদের কেবল এতেই খুশি হওয়া উচিত নয় যে, আমরা মুসলমান আখ্যায়িত হই এবং لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ কলেমায় বিশ্বাসী। যারা কুরআন পড়ে তারা খুব ভালোভাবে জানে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল বুলিসর্বস্ব দাবির ফলেই সন্তুষ্ট হন না আর নিছক মুখের কথাতেই কোনো গুণ মানুষের মাঝে সৃষ্টি হতে পারে না, যতক্ষণ ব্যবহারিক অবস্থা ঠিক না হবে। [মুখের কথা তো কিছুই না, আসল জিনিস হলো আমল (বা কর্ম)।] যতক্ষণ ব্যবহারিক অবস্থা ঠিক না হয় ততক্ষণ কোনোই লাভ হয় না। ইহুদিদের ওপরও এমন এক যুগ এসেছিল যখন তাদের মাঝে কেবল মুখের বাগাড়ম্বরই অবশিষ্ট ছিল এবং তারা শুধুমাত্র মুখের কথাকেই যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল। মুখে তো তারা অনেক কিছুই বলতো, কিন্তু মনের ভেতর নানারকম অপবিত্র ধ্যানধারণা ও বিষাক্ত চিন্তাভাবনায় ভরা ছিল। একারণেই আল্লাহ্ তা'লা সেই জাতির ওপর বিভিন্ন রকম শাস্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে নানারকম বিপদাপদে নিপতিত করেন ও লাঞ্ছিত করেন। এমনকি তাদেরকে শূকর ও বানর আখ্যা দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় হলো তারা কি তওরাতে বিশ্বাস করত না? তারা অবশ্যই বিশ্বাস করত আর নবীদেরকেও মানত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কেবল এতটুকু বিষয়কেই পছন্দ করেন নি যে, তারা নিছক মৌখিকভাবেই মান্যকারী হবে আর তাদের হৃদয় মৌখিক স্বীকৃতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে না। মুখে মুখে তো ঠিকই বলে, কিন্তু হৃদয় তদনুযায়ী আমল করছে না যা মুখ বলছে। তিনি (আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কেউ যদি মৌখিকভাবে বলে, আমি খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় সত্তা বলে মান্য করি আর মহানবী (সা.)-এর রিসালতের প্রতি ঈমান রাখি, অনুরূপভাবে ঈমানের অন্যান্য বিষয়ও স্বীকার করি, কিন্তু এই স্বীকারোক্তি যদি কেবল মৌখিক দাবি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে আর হৃদয় স্বীকৃতি না দেয় তবে তা হবে নিছক বুলিসর্বস্ব দাবি। অন্তর থেকে ধ্বনি উৎসারিত না হওয়া পর্যন্ত মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। এছাড়া মানুষের হৃদয় ঈমান না আনা পর্যন্ত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আর আমল তথা কর্মের মাধ্যমে সেসব বিষয়াদি প্রকাশ করাই তার ঈমান আনার পরিচয় বহন করবে; নতুবা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু হবে না। আর আমলের অবস্থা কী? তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধান মান্য করা যা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি যে, প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হয় যখন (মানুষ) সবকিছু পরিত্যাগ করে খোদা তা'লার দিকে মনোযোগী হয় এবং প্রকৃত অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়। শুধু অঙ্গীকার করলেই হবে না, কার্যত ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! মানুষ সৃষ্টিকে প্রতারিত করতে পারে। কাউকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে দেখে অথবা সৎকর্ম করতে দেখে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে। মানুষ (শুধু) আমল দেখতে পায়। কাউকে মসজিদে এসে নফল নামায পড়তে দেখে বলতে পারে যে, লোকটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী; সে মসজিদে আসে, অথবা অন্য কোনো সৎকর্ম করে, যেমন চাঁদা দিচ্ছে (দেখে বলতে পারে,) লোকটি বেশ

পুণ্যবান। অর্থাৎ মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে, কিন্তু খোদা তা'লা ধোঁকায় পড়েন না। তাই আমলের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকা উচিত। যেসব আমল করবে সেক্ষেত্রেও নিষ্ঠা থাকা উচিত আর নিষ্ঠা সেটিই যা একান্ত আল্লাহ্ তা'লার জন্য হবে। এটিই সেই বৈশিষ্ট্য যা আমলের মাঝে সক্ষমতা ও নৈপুণ্য সৃষ্টি করে। তিনি (আ.) বলেন, এখন স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা যে কলেমা দৈনিক পাঠ করি তার অর্থ কী? কলেমার অর্থ হলো, মানুষ মৌখিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং অন্তর দিয়ে তার সত্যায়ন করে যে, আমার উপাস্য, প্রেমাস্পদ এবং অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খোদা তা'লা ভিন্ন অন্য কিছু নয়; যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, اِلٰہَ শব্দটি প্রেমাস্পদ এবং প্রকৃত লক্ষ্য ও উপাস্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা থাকবে আর তিনিই সেই উদ্দেশ্য যাকে লাভ করা মানবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে, জাগতিক কোনো কিছু নয়, আর ইবাদত (উপাসনা) কেবল তাঁরই করা হবে; প্রচ্ছন্ন কোনো শিরক্ও যেন না থাকে। তিনি (আ.) বলেন, اِلٰہَ শব্দটি প্রেমাস্পদ, প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উপাস্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কলেমা কুরআন শরীফের সকল শিক্ষামালার সারাংশ যা মুসলমানদের শেখানো হয়েছে। যেহেতু একটি বিরাট ও বিশাল গ্রন্থ আত্মস্থ করা সহজ কাজ নয়, কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখা তো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, তাই এ কলেমা শেখানো হয়েছে যেন মানুষ সর্বদা ইসলামী শিক্ষার সারাংশকে দৃষ্টিপটে রাখে আর সেই সারাংশ কী? তা হলো, لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ, অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই। তিনিই আমার চাওয়া। তিনিই আমার অভিষ্ট লক্ষ্য। তিনিই আমার প্রেমাস্পদ। আর সত্যকথা হলো মানুষের মাঝে এই গূঢ়তত্ত্ব সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নাজাত তথা মুক্তি নেই। তাই তো মহানবী (সা.) বলেন, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃত অন্তঃকরণে لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ স্বীকার করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। মানুষ ধোঁকা খায়। এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, সে যদি মনে করে, তোতা পাখির ন্যায় বুলি আওড়ালেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে আর এতে যদি কেবল এতটুকুই বাস্তবতা থাকত তাহলে সকল আমল বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে যেত। নিছক لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ বলেই যদি জান্নাতে প্রবেশ করা যায় তাহলে তো সব আমলের প্রয়োজনীয়তাই শেষ হয়ে যায়। তাহলে পবিত্র কুরআনে যে এত বিধিনিষেধ রয়েছে এসবের প্রয়োজনই বা কী ছিল! তাহলে শরীয়তই নাঊযুবিল্লাহ্ বৃথা সাব্যস্ত হয়। না, বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো, এর মাঝে যে মর্ম অন্তর্হিত রাখা হয়েছে তা যেন ব্যবহারিকভাবে মানব হৃদয়ে প্রবেশ করে। এমনটি হলে এমন মানুষ প্রকৃতপক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করে। মানুষ যখন لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ-র মর্মকে উপলব্ধি করে তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর তা কেবল মৃত্যুর পরই নয়, বরং ইহজীবনেও সে জান্নাতে বসবাস করে। তিনি (আ.) অপর এক বৈঠকে এ বিষয়টি আলোচনা করেন আর অন্য পত্রিকা এটিকে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ লিখেছে। তিনি (আ.) বলেন, নিছক মুখের বুলির সাথে আল্লাহ্ কোনো সম্পর্ক রাখেন না, বরং তিনি হৃদয়ের সাথে সম্পর্ক রাখেন। এর অর্থ হলো, যারা সত্যিকার অর্থে এই কলেমার মর্মার্থকে নিজেদের হৃদয়ে গেঁথে নেয় এবং খোদা তা'লার মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে যাদের হৃদয়ে স্থান করে নেয় তারা জান্নাতে প্রবেশ করে। কেউ যখন সত্যিকার অর্থে কলেমায় বিশ্বাসী হয় তখন আল্লাহ্ ছাড়া তার আর কোনো প্রেমাস্পদ থাকে না। সত্য অন্তঃকরণে কলেমা পড়ে নিলে আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কোনো প্রেমাস্পদ থাকতেই পারে না। অর্থাৎ

আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া তার আর কোনো প্রেমাস্পদ থাকে না। এমন কোনো ব্যক্তি হতেই পারে না অগোচরেও যার ইবাদত হবে। আর খোদা তা'লা ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। এমন কোনো জিনিসও থাকে না যার যে অন্বেষী হবে। সে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরই যাচনাকারী হয়ে থাকে। আবদালের যে মর্যাদা এবং গওস ও কুতুব তথা পুণ্যাত্মাদের যে মর্যাদা রয়েছে তা এটিই অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কালেমায় যেন মন থেকে বিশ্বাস থাকে এবং এর প্রকৃত মর্মে যেন আমল করা হয়। যাহোক এরপর তিনি এরই ধারাবাহিকতায় বলেন, একথা সত্য আর সহজেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া যখন মানুষের আর কোনো প্রেমাস্পদ ও লক্ষ্য থাকে না তখন কোনো কষ্ট ও ক্লেশ তাকে ক্লিষ্ট করতেই পারে না। অর্থাৎ মানুষ যদি এ বিষয়টি বুঝে যায় যে, আমার দুঃখ-কষ্টও আল্লাহ্‌রই জন্য তাহলে এসব কষ্ট তাকে ক্লিষ্ট করতে পারে না। এসব দুঃখ কষ্ট দেখে সে বিচলিত হয় না। সে জানে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বন্ধুর সাহায্যে অতি দ্রুত এসে উপস্থিত হন এবং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে আত্মিক প্রশান্তিও দান করেন। তিনি বলেন, এটিই হলো সেই মর্যাদা যা আবদাল ও কুতবগণ তথা পুণ্যাত্মাগণ লাভ করেন। উদ্দেশ্য যদি জগৎ লাভ না হয়ে খোদার সত্তা প্রাপ্তি হয়ে থাকে তাহলে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। সাহাবীগণ এই গূঢ় তত্ত্বটি বুঝেছেন। শুধু কুতুব, আবদাল এবং বিশেষ বিশেষ লোকেরাই যে এ মর্যাদা লাভ করেন তা নয়, বরং সাহাবীদের অধিকাংশই এ মর্যাদা লাভ করেছেন। তারা এই গূঢ় তত্ত্বকে বুঝেছেন তাই আল্লাহ্ তা'লা সেসব সাহাবীকে আমাদের জন্য আদর্শ বানিয়ে দিয়েছেন।

এরপর তিনি বলেন, একথা মনে কোরো না যে, আমরা আবার কখন প্রতিমা পূজা করি! এটিকে অনেক বড় মর্যাদা আখ্যা দেয়ার পরও তিনি সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যেও বলে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল একথা বলো না যে, আমরা প্রতিমা পূজা করি না– এটাই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরাও তো আল্লাহ্ তা'লারই ইবাদত করি। একথা বলে দেয়াই যথেষ্ট (এটি মনে করো না)। তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! প্রতিমা পূজা না করাটা অতি নিম্ন পর্যায়ের বিষয়। হিন্দুরা যারা প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত তারাও এখন প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করছে। মাবূদের প্রকৃত মর্ম অর্থাৎ তওহীদের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে তারা জানে না তবুও তারা প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করছে। মাবূদের অর্থ কেবল মানব পূজা বা প্রতিমা পূজার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় যে, মানুষ অন্য মানুষের বা প্রতিমার পূজা না করলেই হলো। আরো অনেক মাবূদ বা উপাস্য আছে। এই বাহ্যিক মাবূদ বা উপাস্যই শেষ নয়, আরো উপাস্য রয়েছে। একথাই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, প্রবৃত্তির তাড়না ও কুপ্রবৃত্তিও উপাস্য। রীপুর কামনাবাসনা এবং কুপ্রবৃত্তিও উপাস্য হয়ে যায় যখন এগুলো আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়, যখন এগুলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ থেকে বান্দাকে দূরে নিয়ে যেতে থাকে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজা করে অথবা নিজ কামনা বাসনার অনুসরণ করে এবং এর জন্য মত্ত হয়ে যায় সেও মূর্তিপূজারী ও মুশরেক। তিনি (আ.) বলেন, এই لَا কেবলমাত্র বাহ্যিক উপাস্যকেই অস্বীকার করে না, বরং সব ধরনের উপাস্যকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র মাঝে যা বলা হয়েছে তাতে কেবল বাহ্যিক উপাস্যকেই বুঝানো হয় নি, একটি পার্থিব বস্তুর উপাসনাকেই অস্বীকার করা হয় নি, বরং যেকোনো জিনিস, যা আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে দাঁড় করানো হয় তা এই বিষয়ের ঘোষণা প্রদান করছে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লার

আনুগত্য করে না। অতএব তিনি (আ.) বলেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ-র মাধ্যমে একথা বুঝতে হবে যে, এটি সব ধরনের উপাস্যের অস্বীকার করে। তা প্রবৃত্তিগত হোক বা জাগতিক, অভ্যন্তরীণ বা বস্তুগত হোক অথবা বাহ্যিক ও পার্থিব বিষয়াদি হোক, তা মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রতিমা হোক বা বাহ্যিক প্রতিমা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ওপরই নির্ভর করে, তো এটিও এক প্রকারের প্রতিমা হয়ে থাকে। এই প্রকারের প্রতিমাপূজা যক্ষ্মার ন্যায় হয়ে থাকে। যক্ষ্মারোগের ন্যায় হয়ে থাকে যা ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ করে দেয়। বাহ্যিক প্রতিমা তো নিমিষেই চেনা যায় এবং তা হতে পরিত্রাণ লাভ করাও সহজ হয়ে থাকে। আর আমি দেখছি যে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এসব প্রতিমা হতে মুক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই দেশ যা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এখানকার সব মুসলমান কি এদেরই মধ্য থেকে হয় নি? অর্থাৎ যারা মুসলমান হয়েছে তারাও তো একসময় প্রতিমাপূজারী ছিল, কিন্তু (পরবর্তীতে) এরাই মুসলমান হয়েছে। এরপর তারা প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করেছে নাকি করেনি? আর যেভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং হিন্দুদের মধ্য হতেও এমন অনেক ফির্কা বের হয় যারা এখন আর প্রতিমাপূজা করে না। কিন্তু প্রতিমাপূজার অর্থ এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। একথা সত্য যে, মানুষ বাহ্যিক প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু এখনও মানুষ সহস্র প্রতিমা বগলদাবা করে চলছে। আর যাদেরকে দার্শনিক ও যুক্তিবাদী বলা হয়ে থাকে তারাও সেগুলোকে মন থেকে দূর করতে পারে না। তারা দার্শনিক ও যুক্তিবাদী আখ্যায়িত হয়, অনেক দার্শনিক কথা-বার্তা বলে, অনেক যুক্তি উপস্থাপন করে, কিন্তু তাদের হৃদয়েও প্রতিমা রয়েছে, নিজেদের জ্ঞানের বড়াই রয়েছে। সেগুলোকেই তারা প্রতিমা বানিয়ে রেখেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সেগুলোই তাদের প্রতিমা হয়ে আছে। সেগুলোকে তারা (মন থেকে) বের করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতীত এসব কীট ভেতর থেকে বের হতে পারে না। এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম কীট আর সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও ক্ষতি এদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যারা প্রবৃত্তির তাড়নার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার ক্ষুণ্ন করে ও সীমালঙ্ঘন করে আর এভাবে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকারও হরণ করে। এরা এমন নয় যে, পড়াশোনা জানে না; বরং এদের মধ্যে হাজারো মৌলভী ফাযেল ও আলেম পাবে এবং অনেক এমন আছে যাদেরকে ফকীহ্ ও সূফী হিসেবে গণ্য করা হয়, কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও দেখা যাবে তারাও এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত। বান্দার অধিকার যদি প্রদান না করা হয় তা-ও لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ-র অর্থ ভুলে যাওয়ারই নামান্তর। এসব প্রতিমাকে পরিত্যাগ করাই তো বীরত্ব। বিশেষ বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে তুমি ধারণা করবে যে, এরা অনেক পুণ্যবান ব্যক্তি; কিন্তু না, প্রতিমা তাদের অন্তরেও রয়েছে। এসব প্রতিমাকে পরিত্যাগ করাই বীরত্ব। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করা এবং পরিপূর্ণরূপে বান্দাদের অধিকার আদায় করার মাধ্যমেই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ-র প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় আর এটিই বীরত্ব আর সেগুলো চিহ্নিত করার মাঝেই পরম প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা নিহিত। তিনি (আ.) বলেন, এই প্রতিমার দরুনই পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং অসংখ্য হানাহানির ঘটনা ঘটে। এক ভাই অপর ভাইয়ের অধিকার হরণ করে আর এভাবে অসংখ্য মন্দকর্ম এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। প্রত্যহ, প্রতি মুহূর্তে হয় এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি এমনভাবে ভরসা করা হয় যে, খোদা তা'লাকে নিছক একটি অকেজো অঙ্গ আখ্যা দেয়া হয়েছে। খুব অল্পসংখ্যক লোকই আছে যারা একত্ববাদের

প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে। যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় তবে তৎক্ষণাত বলে বসে যে, আমরা কি মুসলমান নই, আমরা কি কলেমা পড়ি না? কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, তারা কেবল এটুকুই ধারণা করে নিয়েছে যে, মুখে কলেমা পাঠ করলাম আর এটিই যথেষ্ঠ। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি যে, যদি মানুষ কলেমা তাইয়্যেবার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় এবং ব্যবহারিকভাবে এর ওপর আমলকারী হয়ে যায় তবে সে অনেক বড় উন্নতি করতে পারে। আর খোদার মহাবিস্ময়কর শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। একথা ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করো যে, আমি যে অবস্থানে দণ্ডায়মান হয়েছি, একজন সাধারণ বক্তা হিসেবে দণ্ডায়মান হই নি আর কোনো গল্প শোনানোর জন্য দাঁড়াইনি, বরং আমি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে বার্তা দিয়েছেন তা আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। কেউ শুনলো কি শুনলো না আর মানল কি মানল না– সে সম্পর্কে আমার কোনো পরোয়া নেই। এর উত্তর স্বয়ং তোমরা দেবে। আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি জানি, আমার জামা'তভুক্ত এমন অনেকেই আছে যারা তওহীদের তথা একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেয় ঠিকই কিন্তু আমি পরিতাপের সাথে বলছি যে, তারা তা মানে না। যে-ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের অধিকার খর্ব করে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে অথবা অন্যান্য পাপ থেকে বিরত হয় না, আমি বিশ্বাস করি না যে, সে তওহীদের মান্যকারী। কেননা এটি এমন এক নেয়ামত, যা লাভ করতেই মানুষের মাঝে এক অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। (তওহীদে বিশ্বাসীদের মাঝে তো এক পরিবর্তন হওয়া উচিত) তার মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং কৃত্রিমতা প্রভৃতির প্রতিমা থাকে না আর সে খোদার নিকটবর্তী হয়ে থাকে। এ পরিবর্তন তখনই আসে, আর তখনই মানুষ সত্যিকার একত্ববাদী হয় যখন এসব অভ্যন্তরীণ অহংকার, আত্মশ্লাঘা, কৃত্রিমতা, হিংসা, শত্রুতা, বিদ্বেষ, কার্পণ্য, কপটতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ প্রভৃতির প্রতিমা দূর হবে। যতদিন এসব প্রতিমা অভ্যন্তরে থাকবে ততদিন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার ক্ষেত্রে মানুষ কীভাবে সত্যবাদী সাব্যস্ত হতে পারে?

অতএব এই রমজানে আমাদের প্রত্যেকের এসব প্রতিমা থেকে নিজেদের পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত, যেন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে সক্ষম হই এবং এর ওপর ঈমান আনয়নকারী হই। তিনি (আ.) বলেন, কেননা এতে তো (আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে) অন্যান্য জিনিসের ওপর ভরসা করার অস্বীকৃতি রয়েছে। অতএব একথা নিশ্চিত যে, কেবল মৌখিকভাবে বলা যে, আল্লাহ্কে এক ও অদ্বিতীয় মানি- এটি কোনো উপকার করতে পারে না। একদিকে কালেমা পড়ে আর অপর দিকে কোনো কথা যদি নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরোধী হয় তাহলে রাগ এবং ক্রোধকে খোদা বানিয়ে বসে। আমি বার বার বলি, এ বিষয়টি সদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এসব গুপ্ত প্রভু বিদ্যমান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মোটেই এই আশা কোরো না যে, তোমরা সেই মর্যাদা লাভ করতে পারবে যা একজন সত্যিকার একত্ববাদী লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে ইঁদুর আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি ভেবো না যে, তোমরা প্লেগ থেকে সুরক্ষিত। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত এসব ইঁদুর হৃদয়ে আছে অর্থাৎ পাপের ইঁদুর, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান শঙ্কায় রয়েছে। আমি যাকিছু বলছি তা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য পদক্ষেপ নাও। তিনি (আ.) বলেন, অতএব কলেমার বিষয়ে আমার বক্তব্যের সারাংশ হলো, 'আল্লাহ্ তা'লাই যেন তোমাদের উপাস্য, প্রেমাস্পদ এবং উদ্দেশ্য হন আর এই মর্যাদা তখনই লাভ

হবে যখন সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ পাপ থেকে তোমরা পবিত্র হবে এবং তোমাদের হৃদয়ের সেসব প্রতিমাকে ছুঁড়ে ফেলবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামর্থ্য দিন, রমজানের এই বাকি দিনগুলোতে আমরা যেন বিশেষভাবে চেষ্টা ও দোয়ার দ্বারা নিজেদের অভ্যন্তরের সকল পাপ দূর করতে পারি। সকল প্রকার গুপ্ত থেকে গুপ্ত শিরক থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। সকল প্রকার প্রতিমা যেন দূর করতে পারি। কেবল আল্লাহ্ তা'লাই যেন আমাদের উপাস্য, উদ্দেশ্য এবং প্রেমাস্পদ হয়ে যান। কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর প্রকৃত রহস্য যেন আমরা বুঝতে পারি এবং আমরা যখন مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ-র স্বীকারোক্তি দিই তখন ব্যবহারিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমাদের সম্মুখে যেন সেই অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শ থাকে যা মহানবী (সা.) আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতীত সম্ভব নয়। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আমাদের এক ব্যবহারিক জিহাদ এবং আধ্যাত্মিক জিহাদ করতে হবে।

রমজানের শেষ দশকে আমরা 'লায়লাতুল কদর' বিষয়ে আলোচনা করে থাকি। লায়লাতুল কদর প্রকৃতপক্ষে তখন লাভ হয় যখন আমরা নিজেদের সবকিছু, নিজেদের সকল কথা ও কাজ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাব এবং তদনুযায়ী আমল করব আর এরপর সেগুলোকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেব এবং এটিই সেই প্রকৃত চিহ্ন যেটি লায়লাতুল কদর লাভের চিহ্ন। আমরা আলো দেখেছি, আমরা অমুক জিনিস দেখেছি, আমাদের এমন অনুভূত হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে, সুগন্ধ পাওয়া গেছে, অমুক জিনিস দেখা গেছে– এগুলো তো সাময়িক বিষয়। আসল বিষয় হলো, আমাদের হৃদয়ে কীরূপ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

কতিপয় জামা'ত আমার এ কথার ওপর ভিত্তি করে দোয়ার বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে যে, যদি আমরা নিষ্ঠার সাথে তিন দিন অনবরত দোয়া করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশিত হতে পারে। যদি এই তিন দিন বিশেষভাবে এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে যে, উক্ত তিন দিন আমরা দোয়ায় অতিবাহিত করব এরপর আবার নিজ নিজ পূর্বের অভ্যাসে ফিরে যাব আর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভুলে যাব তাহলে আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে সম্মক অবগত। তিনি আমাদের নিয়্যতও জানেন। তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই এবং এগুলো করাতে কোনো লাভ হবে না। অতএব আমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই দিনগুলো দোয়ায় অতিবাহিত করতে চাই তাহলে এই অঙ্গীকারের সাথে অতিবাহিত করতে হবে যে, এখন এই দিনগুলো আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত হবে, তাহলে বিরোধীরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছে তা দূরীভূত করার জন্য খোদা তা'লা স্বীয় বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন প্রকাশ করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আমরা যখন খোদার হয়ে যাব, তখন তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের অভিভাবক হয়ে যাবেন। যাহোক, আমি তো এটিও বলেছিলাম যে, জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি বিনাব্যতিক্রমে নিজের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলে এই বিপ্লব সাধিত হবে। অতএব এটিও স্মরণ রাখুন যে, এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি না-ও হয় তবুও যারা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তিনদিন পর এটি মনে করবেন না যে, নাঊযুবিল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শ্রবণ করেননি অথবা কোনো বিপ্লব সাধিত হয়নি। এটি তো হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার যে, তাঁকে এবং তাঁর জামা'তকে আগে হোক বা পরে- সেই সমস্ত বিজয় দান করবেন। হ্যাঁ, যদি আমরা আমাদের অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করি এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-র প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে কেবল খোদা তা'লার সত্তাকেই আমাদের উপাস্য, উদ্দেশ্য এবং প্রেমাস্পদ বানাই আর দুনিয়ার চেয়ে বেশি খোদাপ্রেম এবং খোদা লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই বিপ্লব দ্রুত সাধিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষী, তাঁর প্রতিশ্রুতি শর্তযুক্তও হয়ে থাকে। অতএব আমাদেরকে স্থায়ীভাবে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন সাধনের অঙ্গীকার করতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, রমজানের শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশক। আর যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ। আন্তরিকতার সাথে পড়ে জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম হয়ে যায়।

সুতরাং এ-সমস্ত কথা আমাদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করে যে, মানুষের আমলই মুখ্য আর স্থায়ী আমল হওয়া আবশ্যক। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন যা আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ বলার পাশাপাশি আমল করাও বিশেষভাবে আবশ্যক।

অতএব এই শেষ দশক থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভ এবং প্রকৃত অর্থেই লায়লাতুল কদর অর্জনের জন্য আমাদের لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ কলেমাকে নিজেদের মন-মস্তিষ্কের প্রতিধ্বনি বানাতে হবে এবং নিজেদের প্রতিটি কাজে ও কর্মে তা মেনে চলতে হবে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তদনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালিত করার সামর্থ্য দিন। এই দিনগুলোতে বিশ্বের সামগ্রিক শান্তি ও স্থায়ীত্বের জন্যও দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা মানবতার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)